কিশোরকুমার ছিলেন একের মধ্যে চার, সাত কিংবা নয় প্রতিভা। সাহেবদের দেশে জন্মালে ওঁকে একজন স্পেলবাউন্ড দিলেত্তান্ত হিসেবে বর্ণনা করা হতো, আমাদের দেশেও কিশোর ছিলেন এক বিরল প্রকৃতির দিলেত্তান্ত—হাজার কলা, হাজার ঝামেলা আর হাজারো বাহানায় উজ্জীবিত এক মানুষ। ওঁর পারা, না-পারা কোনওটারই কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না, জীবনের বহু সমস্যাতেও বিশ বাঁও জলে পড়ে হাবুডুবু খাওয়ার প্রতিভাও ওঁর ছিল। আমি জানি না ওঁর জীবনীকাররা ওঁর জীবনকে কমেডি, ফার্স, ট্র্যাজেডি নাকি একটা ফিলোজফিকাল কুইজটিটি হিসেবে দেখবেন। দেখার তো কোনও জরুরি আইন নেই। তবে ওঁর সারা জীবনের চেষ্টায়, সাধনায় এই মহৎ উৎকেন্দ্রিক মানুষটি কিন্তু ওঁর জীবন, জীবন-দর্শন ও শিল্পের কেন্দ্রটিকে চিনিয়ে দিয়ে যেতে কসুর করেননি। যা ছিল ওঁর গান। ওঁর শিল্পের বাকি যা-কিছু ছিল বৃত্তাংশের স্পর্শক বা ট্যাঞ্জেন্ট, তা তাঁর স্বভাবগুণে বা স্বভাবদোষেই হোক। সব কিছুরই কিছুটা-কিছুটা দেখে ও করে ছেড়ে দেওয়ার একটা অভ্যাস ছিল কিশোরের, কিন্তু গানকে তিনি অনুসরণ করেছিলেন তার শেষ সমৃদ্ধি পর্যন্ত। স্টেজে উঠে তিনি অনেক সময়েই গান গাইতেন লাফালাফি ডিগবাজি, পাগলামি করে যা ছিল ওঁর গানের একটা বাহ্যিক, ফিজিক্যাল দিক; কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওই সময়ও কিশোর প্রতিটি সুরের জন্য, সুরের মূর্চ্ছনার জন্য দগ্ধ, বিদ্ধ, বিপন্ন হতেন। যা ছিল তাঁর গানের প্রাণ, আত্মা, মেটাফিজিক্স-এর দিক। কিশোর অনেক প্রেম করেছেন, প্রেম পেয়েছেন ও হারিয়েছেন, অনেক ধনোপার্জন করেছেন, সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন এবং জীবৎকালেই একজন প্রখ্যাততম ভারতীয় হয়ে উঠেছেন। এসব ছিল ওঁর চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ উদ্ভটতার খোরাক, ওঁর ব্যক্তিত্বের বর্ণচ্ছটা। কিন্তু গান ছিল ওঁর স্পন্দন, প্রাণবায়ু, ওঁর শেষ পারানির কড়ি। ওঁর এই গান নিয়ে একটু ভাবনা-চিন্তা করা যাক। কী ছিল ওঁর গানে? দীর্ঘদিন গান গেয়ে আটান্ন বছর বয়সে মৃত্যু হল যাঁর তাঁকে নিয়ে বলতে গিয়েও সবাই 'প্রতিভা' শব্দটি ক্রমাগত

শেষ পারানির কড়ি

কিশোরকুমার নামটি নানা পরিচয়ের সূতোয় গাঁথা একটি বর্ণময় মালা। তিনি গায়ক, অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক, আরও অনেক কিছু। তবুও তাঁর প্রথম প্রেম ছিল গান। নানা ধরনের গানে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল বিস্ময়কর। এই বিস্ময়ের উৎসটি কোথায়? কোথায় ছিল তাঁর জনপ্রিয়তার মূল চাবিকাঠি? গায়নরীতির কোন গুণে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী? এই লেখায় গায়ক কিশোরকুমারের ওপর আলোচনা।

অভিনেতা কিশোর 'বাদিনী' ছবিতে। সঙ্গে জবিন জলিল

ব্যবহার করছেন কেন ? এই প্রশ্নগুলোই আসলে উত্তর। চল্লিশ বছর ধারাবাহিকভাবে গান গেয়ে, দীর্ঘদিন জনপ্রিয়তার চূড়োয় থেকেও কিশোর 'প্রতিভা' থেকে গেলেন কারণ তাঁর গান ও গানের রেঞ্জ সম্পর্কে আমরা কোনও শেষ বিচারে পৌঁছুতে পারলাম না। তিনি বড়সড় তালিমপ্রাপ্ত, দুঁদে গায়ক হলে তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা কিছুটা সুবিধে হতো। যেমন করা যায় রফি, মান্না এবং এমনকি, কিছুটা লতা সম্পর্কেও। কিন্তু তিনি ছিলেন হেমন্ত, দেবব্রত কিংবা মুকেশের মতো অসামান্য কণ্ঠ সম্পন্ন, তালিমনিরপেক্ষ গায়ক। আবার এই তিন গায়কের মতো তিনি বিশেষ কিছু ধরনের গানের মধ্যে নিজেকে সীমিত, সংযত করে রাখেননি। যদিও গানের জীবনের প্রথম দশ কি পনের বছর কিশোর এমন এক স্টাইলে গান গাইতেন যা কিশোরকুমারের টাইপ হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল।

কিশোরকুমারের এই পরিচিত ঢঙটার মধ্যে যে বৈচিত্র্য ছিল না তা নয়—গম্ভীর খাদের স্বরে রোমান্টিক গান, যেমন 'ঝুমরু' ছবির গান, 'ইনা মিনা ডিকা' গোছের মেক্সিকান সুর ও ছন্দভিত্তিক গান, 'ম্যায় বাঙালি বাবু, প্যার করো, নমস্কারো' জাতীয় চটুল ছন্দের কমিক গান, বাংলায় 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ', ইয়ুডলিংয়ের মতো বিদেশী অলঙ্কারে সমৃদ্ধ একাধিক নিবেদন—বৈচিত্র্য যথেষ্টই ছিল এবং সব মিলিয়ে একটা ধন্ধও তৈরি হতো যে কিশোরের গানের এই টাইপটা আসলে কী ? এই সব রকমারি গান থেকেই সম্ভবত মানুষের মনে প্রথম চিন্তাটা আসে যে কিশোর অত্যন্ত প্রতিভাধর শিল্পী কিন্তু এক উৎকেন্দ্রিক, একসেনট্রিক প্রতিভা, সম্পূর্ণ বিকশিত হওয়ার

নিজেকে অনাথ বোধ হচ্ছে—আর ডি বর্মণ

"আমরা বন্ধুত্ব থেকেও বেশি ছিলাম। আমরা ছিলাম দুই ভাইয়ের মতো। একজন সঙ্গীত পরিচালক আর একজন গায়ক—এর মতো আমরা ছিলাম না, আমাদের মধ্যে কোনও বাধা ছিল না। ও নিজেই বুঝে নিতে পারত আমি কী চাই, ওকে কোনও নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হত না। ও চলে গিয়েছে, এখন আর কী বলার আছে। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না ও নেই। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আমার সেরা বন্ধুকে হারিয়েছি। জীবনীশক্তিতে ভরপুর ও সব সময়েই হাসিখুশিতে থাকত, দুষ্টুমিতে ভরা রসিকতার কথা নাই বা বললাম। ও বিশ্বস্তভাবেই ছিল যেন একেবারেই ছোট্টটি। এই মুহূর্তে আমার নিজেকে অনাথ বোধ হচ্ছে। সত্যি সত্যিই ও ছিল আমার সঙ্গীত পরিচালনার কাঠি... আমার মনে হচ্ছে আমি বুঝি শেষ হয়ে গেছি... (বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন)

কৃষ্ণা

মতো ক্ষমতা হয়তো ওঁর নাও থাকতে পারে। সন্দেহটা দানা বাঁধতে থাকে কারণ অভিনয়, পরিচালনা, স্ক্রিপ্ট লেখা, গান গাওয়া ছাড়াও আরেক হরেক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে কিশোর তখনও তাঁর গায়ক-জীবনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে যাচ্ছেন। উপরন্তু তখনও তিনি নিজের সুরেই গাইছেন মূলত এবং সে-সব তাঁর গলার কতকগুলো বিশেষ ক্ষমতা ও অলঙ্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য। আমার যতদূর ধারণা ষাটের দশকের মাঝামাঝি শচীনদেব বর্মণের পুরোপুরি নাগালে পড়ার আগে কিশোর নিজেও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন তাঁর নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'চারুলতা' ছবিতে কিশোরকে দিয়ে 'আমি চিনি গো চিনি' রবীন্দ্রসঙ্গীতটি অত উদাত্ত, খোলামেলাভাবে গাইয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। তবে কিশোরকে তাঁর স্বীয়সৃষ্ট টাইপ থেকে বার করে এনে এক প্রকৃত নতুন চেহারায় তুলে ধরেছিল শচীনদেবের সুরারোপিত 'গাইড' ছবির অসাধারণ খোলা আওয়াজের গান 'গাতা রহে মেরা দিল'। গানটির সিকোয়েন্স, ছবিতে সেটির বিশেষ মাহাত্ম্য এবং ছবির অন্যান্য সমস্ত গানের সঙ্গে তার সম্পর্ক—সব কিছুই ভয়ানক তাৎপর্যপূর্ণ। সারা ছবিতে মহম্মদ রফির গলায় করুণ, রোমান্টিক গান। ছবির শেষভাগ ট্র্যাজিক, গোড়ার দিকে নায়িকা ওয়াহিদা ও তাঁর প্রৌঢ় স্বামী কিশোর সাহুর বিষণ্ণ দাম্পত্যের ক্রমবিস্তার। এই দমবন্ধ-করা জীবন থেকে দেব আনন্দের সংস্পর্শে হঠাৎ এক মুক্ত হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ার যে সুযোগ পেল ওয়াহিদা সেই সাঙ্ঘাতিক নাটকীয় মুহূর্তে কিশোর-লতার কণ্ঠে ওই ভিন্ন স্বাদের গানটি

কলকাতার মেলা '৮৬ প্রথম দিনে চাদরে ঢেকে বৃষ্টি থেকে ছেলে সুমিতকে রক্ষা করছেন কিশোর

বসিয়ে দিলেন শচীনদেব। গোটা ছবিটা অপূর্ব অপূর্ব সব গানে ঠাসা হলেও তার ভেতর থেকে সম্পূর্ণ নিজস্বতায় ঠিকরে বেরিয়ে এল কিশোরের কণ্ঠধ্বনি আর প্রাণস্ফূর্তি।
কিশোরের গায়ক জীবনেরও এক নতুন মুক্তি এই গান থেকে। কারণ এর পর কিশোরের পঞ্চাশের দশকের গায়নরীতি ক্রমশ পিছনে মিলিয়ে যেতে থাকে, নতুন নতুন হিরোর জন্য নতুন নতুন মেজাজের গানের ডাক পড়তে লাগল কিশোরের। কিশোর কোন গান পারেন, এবং কোন গান পারেন না এই প্রশ্ন নিয়ে কোনও মিউজিক ডিরেক্টার বা ফিল্মের নায়ক বা দর্শক কিংবা শ্রোতৃ সমাজ আর মাথা ঘামাবার সময় পাননি। ষাটের দশকের শেষপাদ থেকে এক নতুন প্রজন্মের ধ্বনি হিসেবে ফুটে উঠছিল কিশোরের কণ্ঠ। এক সরল,, স্বাভাবিক, উদার কণ্ঠ যা যে-কোনও প্যাঁচ-পয়জারের সুরের কেরামতির মধ্যে অনায়াসে ঢুকে পড়ে এবং অনায়াস লাবণ্যে প্রকৃত জায়গায় পৌঁছে যায়। অথচ এই সব কিছু করার মধ্যেও কিশোর তাঁর কণ্ঠের সেই অনেওয়াজি, খেয়াল-খুশির ধরনটা হারিয়ে ফেললেন না। গানের ক্ষেত্রেও বহুমুখী, ভার্সেটাইল হওয়া সত্ত্বেও কিশোর যে কী করে এত মৌলিক, স্বতন্ত্র এবং ফর্মুলাবিহীন ছিলেন তা শিল্পী এবং শ্রোতা মাত্রেই ভাবলে অবাক হন। তালিম, রেওয়াজ, ফর্মুলা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কোনও কিছুতেই যে শিল্পচাতুরীর ব্যাখ্যা চলে না তাকে প্রতিভা ছাড়া আর কীই বা বলা যায়?
কিশোরের গানের প্রধান সম্পদ ছিল তাঁর যৌবনমুক্ত আওয়াজ। খোলা গলায় সমস্ত সুরে দাঁড়িকে না ছুঁয়ে গাওয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ওঁর। গলায় নানান কিসিমের কমিক সাউন্ডস বা উদ্ভট ধ্বনি তুলে মজার গানকে প্রায় ছবির মতো ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, গানের ডিটেলিং করতে পারতেন। একেবারে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো না হলেও কিশোরেরও 'হামিং' ছিল খুবই জোরালো ও আকর্ষণীয়। আর ইয়ুডলিং ছিল তো ওঁর প্রায় নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু কিশোর যত বড় গায়ক হয়ে উঠেছিলেন তা হতে এহেন কণ্ঠসমৃদ্ধির প্রয়োজন প্রায় অবধারিত। এরকম কিছু কিছু নিজস্ব ব্যাপার ছাড়া ওই পর্যায়ে পৌঁছনোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যজনক কাণ্ড যেটা ঘটিয়ে বসেছিলেন কিশোর তা আরও জটিল ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। একটা খোলা মাঠের বাউলাঙ্গ কণ্ঠকে তিনি নায়কের কণ্ঠধ্বনি করে তুললেন। একেবারে অপ্রভাবিত কণ্ঠ হলেও কিশোরের গায়নে অনুপ্রেরণা ছিল কে এল সায়গল এবং শচীনদেবের কণ্ঠ। সায়গলের গলার সঙ্গে আওয়াজ ও মেজাজের একটা লক্ষণীয় মিল চোখে পড়লেই, কিশোর চিরকাল সায়গলকে

'গাইড' ছবির সেই মুহূর্তটি, যখন নেপথ্য থেকে কিশোরের কণ্ঠ গেয়ে ওঠে 'গাতা রহে মেরা দিল'

নিজের সমস্যা বলে ঘোষণাও করে এসেছেন। শচীনদেব সম্পর্কে কী বলেছিলেন না জানলেও 'গাইড'-উত্তর কিশোরের গানের—বলা উচিত, শ্রেষ্ঠ গানের—মধ্যে একটা আলগা পল্লীচরিত্র আছে, যা শচীনদেব থেকে নেওয়া। আর ডি বর্মণের সুরে 'অমর প্রেম' ছবিতে রাজেশ খান্নার ঠোঁটে কিশোর যখন গাইলেন 'কুছ তো লোগ কহেঙ্গে/লোগকা কাম হ্যায় কহেনা' তখন চেপে চেপে সুর ছাড়ার বিরোধী কিশোর তাঁর খোলা কণ্ঠের উচ্চারণেও একটা নাসিক্যধ্বনি যোগ করেছিলেন একটু বাড়তি অনুভূতি সঞ্চারের জন্য, যে ধ্বনির জন্য অমর হয়ে আছেন শচীনকর্তা। শচীনদেবের ধারায় একটা উদাস ভাবও গানে যোগ করেছিলেন কিশোর। 'দুখেকি তরহ বজতা রহা হুঁ ম্যায়/কভি ইস্ পদমে, কভি উস্ পদমে' কিংবা শচীনদেব পরিচালিত 'অভিমান' ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরভিত্তিক 'তেরে মেরে জীবনকি ইয়ে মৈনা' গানে সুরকে আলতোভাবে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়ায় কৃতি রপ্ত হয়ে গিয়েছিল কিশোরের। ক্রমে স্ফূর্তির গানের জন্য স্মরণীয় হয়ে উঠেছিলেন যে কিশোর এক কালে তিনি হিন্দি ভাষায় করুণ গানের এক ধারায় প্রবর্তক হয়ে উঠলেন। গত দেড়-দুই দশকে কিছু করুণ গান তিনি এমনই এক পর্যায় গেয়েছেন যা প্রকৃত অর্থে তুলনারহিত। আমি শুধু একটি মাত্র গানের উল্লেখ করব—'জিন্দেগিকা ইয়ে সফর ইয়ে কৈসা সফর'। তিমা লয়ের গানে যে তিনি কী বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তা বিস্ময়ের সঙ্গে নজর করতে থাকলাম আমরা।

কিশোর যা, তা তিনি হতে পারলেন আরও একটা কারণে। তিনি সহজ, কঠিন সব গানকে সহজভাবে গাইবার একটা চলন সৃষ্টি করলেন। ওই সহজ স্টাইলটা রপ্ত করা যে কত কঠিন তা না বুঝেও যাট, সত্তর ও আশির দশকের গান-পাগলরা ওঁর গান একে একে ঠোঁটে

কিশোরকুমারের নিজের পছন্দ তাঁর নিজের প্রিয় দশটি গান

দুখী মন মেরে—ছবি : ফান্টুস ● সঙ্গীত পরিচালক : শচীন দেববর্মন
জগমগ জগমগ করতা নিকলা—ছবি ঝিমঝিম ● সঙ্গীত পরিচালক : ক্ষেমচাঁদ প্রকাশ
হুসন ভী হ্যায় উদাস উদাস—ছবি : ফরেব ● সঙ্গীত পরিচালক : অনিল বিশ্বাস
চিঙ্গারি কোই ভড়কে—ছবি : অমরপ্রেম ● সঙ্গীত পরিচালক : রাহুল দেববর্মন
মেরে নয়না সাওন ভাদো—ছবি : মেহবুবা ● সঙ্গীত পরিচালক : রাহুল দেববর্মন
কোই হমদম না রহা—ছবি : ঝুমরু ● সঙ্গীত পরিচালক : কিশোরকুমার
মেরে মেহেবুব কয়ামত হোগী—ছবি : মিস্টার এক্স ইন বম্বে ● সঙ্গীত পরিচালক : লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল
কোই হোতা জিসকো অপনা—ছবি : মেরে অপনে ● সঙ্গীত পরিচালক : সলিল চৌধুরী
ওহ্ শাম কুছ অজীব থি—ছবি : খামোশী ● সঙ্গীত পরিচালক : হেমন্তকুমার
বড়ি শুনি শুনি হ্যায়—ছবি : মিলি ● সঙ্গীত পরিচালক : শচীন দেববর্মন

'আরাধনা' ছবির একটি দৃশ্য । যে ছবিতে গান গেয়ে কিশোরকুমার নিজেকে প্রযোজকদের কাছে অপরিহার্য করে তুলেছিলেন

ওঠাতে লাগল । যা করে সিনেমার নায়কের গান জনগণের গান হয়ে উঠল । ওঁর গান দেব আনন্দ, রাজেশ খান্না কি অমিতাভ বচ্চনকে একেকটা জনপ্রিয় ইমেজ সম্প্রদান করল, যেহেতু খোলামেলা তাই এই গানগুলোর পিকচারাইজেশনও খুবই স্বাভাবিক হয়ে উঠল. পর্দায় গান ও ব্যক্তিত্ব মিশল আম এবং দুধের মতো । রাজ কাপুর বা মনোজকুমারের কণ্ঠে মিশতেন মুকেশ, দিলীপকুমার বা শাম্মি কাপুরের কণ্ঠে মিশতেন রফি. কিন্তু সত্তর ও আশির দশকের তাবৎ নায়কের কণ্ঠে মিশতেন কিশোর কারণ কালে-কালে সমস্ত ম্যানারিজম বিসর্জন দিয়ে শিল্পী তাঁর যুগের ধ্বনি হয়ে উঠেছিলেন ।

কিশোরের গানে একটা বাঙালি বাবু লুকিয়ে থাকতেন. কী বাংলা গানে. কী হিন্দি গানে । যার আরেক নাম সোফিস্টিকেশন । একটা অত্যন্ত চ্যাংড়া গানেও একটা মার্জিত ব্যাপার থাকত ওঁর । রফির 'ইয়াহু' । মার্কা চ্যাংড়া গান আজ আর শোনা যায় না কারণ ওতে ওই সোফিস্টিকেশনটা নেই । কিন্তু কিশোরের 'ইনা মিনা ডিকা' আজও শোনা যায় । বিদেশের বহু ধরনের সুর ও ছন্দ ও অলঙ্কার কিশোর নিজের প্রয়োজন মতো গ্রহণ করেছেন, তারপর একটা সময়ে সব উজাড় করে হাওয়ায় উড়িয়ে তাঁর বাউল চরিত্রে নিজেকে ন্যস্ত করেছেন । গজলের প্রতিও ওঁর অনুরাগের কথা বার বার ব্যক্ত করেছিলেন তিনি, কিন্তু সেরকম সুর ও গান তিনি পাননি । সারা জীবন ধরে নানানভাবে তিনি বদলে নিয়েছেন তাঁর গানের ধরনধারণ ; আর তা যে পারলেন তার কারণও ওঁর ওই নির্বচ্ছিন্ন ধ্বনি । শেষ দিকে হার্ট অ্যাটাকের পর যখন বুঝলেন দমে টানছে, ফলে নিজের গানের ফর্ম্যাট ভেঙে আর নতুন কিছু হবে না তখন থেকেই অবসর নেবার কথা বলছিলেন । ভেতরে ভেতরে বিষণ্ণ মানুষটি বাইরের হাত-পা ছোঁড়া দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখছিলেন ।

জীবনের গোড়া থেকেই গান ছিল কিশোরের ধ্রুবতারা । বাইরের হাত-পা ছোঁড়া দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখছিলেন ।

খাণ্ডোয়া থেকে বম্বে এসে যখন গানের ভবিষ্যৎ খুঁজছেন তখন তরুণ কিশোরকুমার এক তরুণী লতা মঙ্গেশকারের সঙ্গে শহরতলি থেকে ট্রেনে করে স্টুডিও পাড়ায় আসতেন । লতা বহু দিন আগের এক সাক্ষাৎকারে সেই সব দিনের কথা স্মরণ করেছিলেন । তাঁর কাছে কিশোর ছিলেন তখন এক উদ্দীপ্ত, তারকা-আঁখি তরুণ, আকাশ যার আকাঙ্ক্ষার সীমা । গান গাইছিলেন দু'জনেই, কিন্তু লতা উঠে গেলেন কোথায় । ভাগ্যলোরথ কিশোর অবিশ্যি অজস্র খ্যাতি জোটালেন প্রথমে অভিনেতা, পরে পরিচালক হয়ে । কিন্তু ভেতরের বেদনাটা থেকেই গেল—গান ! তারপর আবার কিশোর গায়ক হলেন আর, আহা ! কী গায়ক । গান থেকে একজন মানুষ কত জনপ্রিয়, কত মহৎ হয়ে উঠতে পারেন তার এক নজির সৃষ্টি করে গেলেন । যার আরেক নজির লতা নিজে ।

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

কিশোরদা বিহীন অবস্থার কথা ভাবতেই পারছি না—আশা ভোঁসলে

"আমার মনে হচ্ছে আমারই কিছুটা বুঝি হারিয়ে ফেলেছি, হারিয়েছি আমার নিজের কণ্ঠ । আমি যখন আবার গান গাইতে উঠব, তখন আর সেই সময়টা ফিরে আসবে না । কিশোরদাবিহীন অবস্থার কথা আমি ভাবতেই পারছি না ।"

চিরকালের সেরা মনোরঞ্জক—মান্না দে

"চিরকালের সেরা মনোরঞ্জক" হিসেবেই ওকে আমি চিহ্নিত করি । প্রথম যখন ক্ষেমচাঁদের পরিচালনায় 'মুকদ্দর' ছবির জন্য গান গাইতে শুনি, তখনই আমি বলেছিলাম যে এক প্রতিভার আবির্ভাব হল । প্রথম গান শুনেই আমি কিশোরের ভক্ত হয়ে যাই । আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, যে ও আর নেই ।"

কৃষ্ণ